ঐ শুনি চরণধ্বনি

অজিত বাইরী

গ্রামের সম্ভ্রান্ত কৃষক - পরিবারে লেখাপড়ার চর্চা ছিল; কিন্তু রবীন্দ্র কাব্যের সঙ্গে পরিচিত হবার পরিমণ্ডল ছিল না। উদয় নারায়ণপুর থানার বিনোদ বাটী কলকাতা শহর থেকে মাত্র সাতচল্লিশ কিলোমিটার দূরে। পাদপ্রদীপের নীচে জমাট অন্ধকার। খুব কম পরিবারের দু'চারজন বালক-বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হোত। অভিভাবকদের তেমন গরজ ছিল না ছেলে - মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর। তাঁরা নিজেরা গায়ে - গতরে খাটতেন মাঠে - ঘাটে। কায়িক শ্রমের আয়ে গ্রাসাচ্ছাদনে দিন গুজরান করতেন। তাঁদের ছেলেমেয়েরাও তাঁদেরই অনুসরণ করবে— এমনই ভাবতেন তাঁরা। যত দিন ছোট আছে স্কুলে যাক। তারপর একটু বড় হলে না হয় ফাইফরমাশ খাটার কাজে লেগে যাবে। প্রাইমারির গণ্ডী পার হবার তর সইতো না; তার আগেই মাঠ - ঘাটের কাজে জুড়ে দেওয়া হোত। সেখানে বালক-বালিকাদের রবীন্দ্র কাব্য ও সঙ্গীতের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ কোথায়!

আমার যে পরিবারে জন্ম, সেই পরিবার গ্রামের আর পাঁচটি পরিবার থেকে ছিল স্বতন্ত্র। আমাদের পরিবারে কিঞ্চিৎ শিক্ষার আলো প্রবেশ করে ছিল। ঐ নিরক্ষর গ্রামের ভেতরেও। এবং কৃষিই একমাত্র উপার্জনের উৎস ছিল না। শিক্ষকতাই প্রধান অবলম্বন ছিল অভিভাককদের।

বাবা - কাকা উভয়েই শিক্ষকতা করতেন। অবকাশে মূলতঃ বাবাই জমি - জিরেতের তদারকি করতেন। চাষের খরচ জোগাতেন শিক্ষকতার মাস - মাহিনা থেকে। মজুরির বিনিময়ে কৃষি - শ্রমিক নিয়োগ করা হোত। তাঁরাই বীজ বোনা থেকে ফসল তোলার কাজ সারতেন। খরচ - খরচা বাদ দিয়ে লভ্যাংশ থাকতো খুব কম। তবু পৈত্রিক - সম্পত্তি টিকিয়ে রাখার একদিকে যেমন দায় ছিল, তেমনি অন্যদিকে জমি চাষ - আবাদ করার নেশাও ছিল।

সকাল - সন্ধ্যে তাঁদের গড়াতো কাজের মধ্যে দিয়ে। সেইসব কাজ, যা জীবিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। সাহিত্য পাঠের জন্য হয় তাঁদের অবসর ছিল না, না হয় সাহিত্য পাঠে কখনও অনুরাগবোধ করেননি। ফলে, বাড়িতে দু-চারখানা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, নজরুলের গ্রন্থ মিলবে এমন সম্ভাবনা চিল না। অবশ্য এক- আধটা পাঠ্যপুস্তকের সন্ধান মিলত, যাতে ঐ সব লেখকদের রচনার সন্ধান পাওয়া যেতো। ছোটরা সাধারণত বড়দেরই অনুসরণ করে। বড়দের অনুসরণ করেই নতুন নতুন গ্রন্থের সন্ধান পেতে আগ্রহী হয়, পাঠের অভ্যাসও গ'ড়ে ওঠে। আমার সমুখে তেমন কোনো দিশারি - আলো ছিল না। পরবর্তী সময়ে কিছু কিছু গ্রন্থের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল আমাদের বাড়িতে। রবীন্দ্রজন্ম শতবর্ষে মেজকাকা রবীন্দ্ররচনাবলী খরিদ করেছিলেন। তখন আমি অনেকটাই বড়। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের নীচু ক্লাসের ছাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র এবং শরৎচন্দ্রের দু'একখানা গ্রন্থ নজরে পড়েছিল বাড়িতেই। কারুর বিয়েতে পাওয়া উপহার। তখন অবশ্য বিবাহ উপলক্ষ্যে বই উপহার দেওয়ার রেওয়াজ ছিল। দাতা এবং গ্রহীতা উভয়েই আনন্দ পেতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এভাবেই কিছু বই সংগৃহীত হয়েছিল আমাদের বাড়িতে। বইয়ের স্থান ইদানিংকার মতো দখল করে নেয়নি সাড়ি, গহনা ও অন্যান্য উপহার - সামগ্রী।

সেটা ছিল আমাদের সৌভাগ্যের কাল। শাড়ি, গহনা নিয়ে বড়রা মেতে উঠলেও ছোটদের ও-সবের প্রতি আগ্রহ ছিল না। রঙিন মলাটের বইয়ের আকর্ষণ ছোটদের কাছে অন্যরকম। আমি উপহার পাওয়া বইগুলি পড়েছি না-বলে, বলা উচিত গো - গ্রাসে গিলেছি। সে-বয়েসে বুঝিনি তবু প্রথম পাতা থেকে শেষ পাতা অব্দি মজে থেকেছি দুর্গেশনন্দিনী, দেবীচৌধুরানী, আনন্দমঠ, চন্দ্রশেখর, বড়দি, মেজদি, বিরাজ বৌ, চরিত্রহীন, দত্তা, শ্রীকান্ত, চোখের বালি, বৌঠাকুরানীর হাট, শেষের কবিতা, গোরা, নৌকাডুবি -তে। সে এক অদ্ভুত স্বপ্নময় জগৎ! কল্পনার ডানা মেলা আকাশ।

যতদূর মনে পড়ে, আমাদের গ্রামে কখনও কোনও সাময়িকপত্র ঢোকেনি। পোস্টাপিসে দেখেছি, কাগজে মোড়া সচিত্র - পত্রিকা। 'সোভিয়েত দেশ' তখন খুব সস্তায় পাওয়া যেতো। সেগুলোই আসতো দু'একখানা কারো কারো বাড়িতে। গ্রামে কোনো লাইব্রেরি ছিল না। এক কিলোমিটার দূরের পার্শ্ববর্তী গ্রামে ছিল। সেখানে দু'একখানা সাময়িকপত্রের সন্ধান মিলতো। কল্লোল, কালিকলম, শনিবারের চিঠি, ভারতবর্ষ, বঙ্গবাসী আমার বাল্যে এমন - কি কৈশোরোত্তীর্ণকালেও এসবের পৃষ্ঠা ওল্টাবার সুযোগ ঘটেনি। কালে কালে বুঝেছি, অন্ধকার কীভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছিল চারপাশ থেকে। সাহিত্য তার দরজা উন্মুক্ত করতে ঢের সময় নিয়েছে আমার জীবনে।

সহজপাঠে শিল্পী নন্দলাল বসুর ছবি সহযোগে রবীন্দ্র লেখনীর মাদকতা আমাকে কী পরিমাণ আকৃষ্ট করেছিল, আজও আমি ভুলতে পারি নি। কে জানে, রবীন্দ্রপ্রীতির জন্ম সেখান থেকেই কী না। পাঠ্য পুস্তকের প্রতি আকর্ষণবোধ করা পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ঘটনা নয়। কিন্তু স্পষ্ট মনে আছে আমার, পড়ার জন্য ঐ বইখানি কাছে টেনে নিতে কখনও অনাগ্রহবোধ করতাম না।

আমাদের বাল্যকালে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে রবীন্দ্র জন্মদিন পালনের খুব রেওয়াজ ছিল। সেই উপলক্ষ্যে পঁচিশে বৈশাখে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠানের আয়োজন হোত। স্টেজ তৈরি হোত, জেনারেটার চালিয়ে বিদ্যুতের আলো জ্বালানো হোত। নদী, গাছপালার দৃশ্য আঁকা স্ক্রীন ঝোলানো হোত পেছনে। সন্ধেবেলা অনুষ্ঠান। আমার বয়সি কেউ কেউ রবীন্দ্রনাথের লেখা কবিতা আবৃত্তি করবে। উঁচু ক্লাসের ছাত্ররা ছোটগল্পের নাট্যরূপে অভিনয় করবে। ছোটগল্পকে নাটকে রূপদান করতেন কোনো শিক্ষক।

আমি কখনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করিনি। দর্শক আসনে বসতাম পাতা শতরঞ্চি বা বেঞ্চে। আমার ক্লাসের এবং ওপরের ও নীচের ক্লাসের ছেলে মেয়েরাও মুখস্ত কবিতা আবৃত্তি করতো। কণ্ঠে আবেগ সঞ্চার করে তারা কবিতা শোনাত। আবৃত্তি করতে করতে কোনো পঙ্‌ক্তি ভুলে গেলে, পর্দার আড়াল থেকে অনুষ্ঠানে সঞ্চালনায় থাকা শিক্ষক মহাশয় তা ধরিয়ে দিতেন। রবীন্দ্র জন্মদিনের এইসব অনুষ্ঠানে একই কবিতা কতবার শুনেছি কতজনের কণ্ঠে। 'বীরপুরুষ', 'প্রশ্ন', 'সমব্যথী', 'মাস্টার

- বাবু', 'বনবাস' ইত্যাদি কবিতা। সে-সব শুনতে শুনতে মন ভেসে যেত তারা-ভরা আকাশের দিকে।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' কবিতাটির আবৃত্তি ঐ সব মঞ্চে হয়তো কেউ কেউ করে থাকবে। কিন্তু আমার সেভাবে মনে পড়ে না যে, আমি অনেকবার শুনেছি। কবিতাটি সম্ভবত নীচু ক্লাসের কোনো পাঠ্য - পুস্তকে ছিল। সবটুকু না। আংশিক। আমি অক্ষরে চোখ রেখে কতবার যে ঐ কবিতাটি পাঠ করেছি। কানে শুনে যে তৃপ্তি, পাঠ করার তৃপ্তি অন্যরকম। নিজের মনে কল্পনায় ভেসে যাওয়া যায়। বই থেকে চোখ তুলে জানলার বাইরে যখন দৃষ্টি মেলে রাখতাম, তখন কানে বাজতো দূরের মন্দিরের ঘন্টাধ্বনি।

এই কবিতাটিই আমার হৃদয়ের কোনো কবিতার সলতে উস্‌কে দিয়েছিল। আমার মনের সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিল কল্পনার দুটি ডানা। কাগজে কলমে কবিতা রচনা করব, এমন তো ভাবিনি কখনও; কিন্তু আমি কবিতা রচনা শুরু করেছিলাম মনে মনে।

মেঘের উপর মেঘ করেছে—/ রঙের উপর রঙ,/ মন্দিরেতে কাঁসর ঘন্টা/ বাজল ঢং ঢং।/ ও পারেতে বৃষ্টি এল,/ ঝাপসা গাছপালা।/ এপারেতে মেঘের মাথায়/ একশো মানিক জ্বালা। পড়তে পড়তে তন্ময় হয়ে যেতাম। চোখের সামনে ভেসে উঠতো নদী, মন্দিরের চুড়ো, সূর্যাস্ত। আর কানে বাজতো কাঁসর ঘন্টার ঢং ঢং।

ছোটবেলায় মনে গেঁথে যাওয়া এই কবিতাটির কথা আজও আমি ভুলতে পারিনি। এই কবিতাটি পাঠ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমার ধারণা জন্মেছে, কবিতা শোনার থেকে পাঠেই বুঝি তৃপ্তি বেশি। পরবর্তীকালে অনেক বিখ্যাত আবৃত্তি শিল্পীদের কণ্ঠে আবৃত্তি শুনেছি, মুগ্ধও হয়েছি। কিন্তু সামান্য কিছু অভাবও যেন থেকে গেছে। যে অভাব - পূরণ একমাত্র পাঠেই সম্ভব। এ-কথাও অবশ্য অস্বীকার করা যাবে না, আবৃত্তি-ও অনেক কবিতা আন্তর- সৌন্দর্য উন্মোচনে সাহায্য করেছে। কিন্তু সে ভিন্ন প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্র কবিতার প্রতি অনুরক্ত হলেও অনেকটা বয়েস পর্যন্ত রবীন্দ্র সঙ্গীতের আবেদনে আমার কান তৈরি হয়নি। আরো অনেকের মতো রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুরে একঘেয়েমি স্পর্শ পেতাম; ফলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত থেকে কান ফিরিয়ে রাখতাম। সেই ভুল ভাঙালেন শ্রী সলিল ভাদুড়ী। তিনি ছিলেন শ্রদ্ধেয় প্রমথনাথ বিশি-র দূর সম্পর্কের আত্মীয়। আমার সহপাঠী ছিলেন। আমার থেকে বয়েসে বড়। তাঁকে সলিলদা বলেই ডাকতাম। তিনি সাধারণ ডিগ্রি কোর্স পাশ করে আবার কৃষি - বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক স্তরে ভর্তি হয়েছিলেন। সেই সলিল দা বললেন, গানের কথাগুলো মন দিয়ে শোন। মানে বোঝার চেষ্টা করো। তারপর সুরের দিকে কান ফেরাবে।

তাঁর পরামর্শ মতো আমি গানের কথাগুলো হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা করলাম। আর আমার কাছে একের পর এক বিস্ময়ের দরজা খুলে যেতে লাগল। আমি মণিমাণিক্যের এক অত্যাশ্চর্য খনিতে প্রবেশ করলাম। সেদিন সন্ধেবেলা, শুক্লপক্ষ। আকাশের অল্প - অল্প ভাঙাচোর মেঘ। তার ফাঁকে ফাঁকে চন্দ্রকিরণ। আমি বসেছিলাম সলিলদার বিছানায়। তাঁর কাছে রেডিও ছিল। তখন সেই যন্ত্রে বাজছিল — 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে/ ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা।' প্রেমের অনুরাগ - মিশ্রিত সেই গান, আর চন্দ্রালোকিত সান্ধ্যকালীন আবহ গানটির সঙ্গে আমাকে একাত্ম করে দিয়েছিল। অনেক রাত অব্দি ঘুম এল না। বুকের কোনে উঁকি দিচ্ছিল ভালোবাসার মুখ।

আমি রবীন্দ্রগানে সেই প্রথম আকর্ষিত হলাম। সলিলদার পরামর্শ মতো গানের বাণীগুলোকে অনুধাবন করতে সচেষ্ট হলাম। এবং আমরা সামনে অনাস্বাদিত এক আলোর জগৎ উন্মোচিত হয়ে গেল। প্রথমত গীতাঞ্জলির সমস্ত গান একটির পর একটি পাঠ করতে থাকলাম। এত বিচিত্র অনুভব, এমন কাব্যিক সুষমামন্ডিত আমাকে প্রায় উন্মাদ করে তুলতো। গীতবিতানে সংকলিত গানগুলির মাধুর্য আহরণে সচেষ্ট হলাম। এমনি করেই ধীরে ধীরে রবীন্দ্রসঙ্গীতে অনুরাগ জন্মাল। আজ মনে হয়, সলিলদা আমার জীবনের সবচেয়ে মূল্যবান অধ্যায়টি শুরু করেছিলেন, যা আজও প্রবহমান। ক্লান্তি-অবসাদে, দুঃখে - বেদনায়, শোকে - সান্ত্বনায় এই গানই জীবন পাথেয়। এমন কোনো মানবিক অনুভূতি আছে কি, যা রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে স্পর্শ করেন নি। আমার বিস্ময়ের অন্ত নেই। আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষের সামর্থই বা কতটুকু যা তিনি অনুভব করেছেন, যা তিনি প্রকাশ করেছেন, তার সবটুকুর নাগাল পাব? এক ভদ্রলোককে তাঁর বক্তৃতায় বলতে শুনেছিলাম, 'মানুষ মরণকালে হরিনাম শোনে। আমি রবীন্দ্রসংঙ্গীত শুনতে চাই।' আমি নিজেও সেই ভদ্রলোকের অনুভবের সঙ্গে একাত্মবোধ করি।

রবীন্দ্রনাথের ''জীবনস্মৃতি''র আকর্ষণ আমার কাছে যেমন অনিবার্য, তেমনি তাঁর পত্রগুচ্ছেরও। কত রকম পরিস্থিতিতে তিনি রচনা করেছেন একটির পর একটি পত্র। কী তার প্রাচুর্য। আমি কতদিন, কত সন্ধ্যায় মগ্ন হয়ে পড়েছি সে-সব পত্র। পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে নানা জনকে লিখেছেন সেই সব পত্র। সে পত্রে ফুটে উঠেছে তাঁর অন্তরের সৌন্দর্য, প্রকৃতি-মুগ্ধতা, সাংসারিক বিবিধ দায়দায়িত্ব এবং প্রতিকূলতাকে জয় করার অসীম সহনশীলতা। অপমান ও লাঞ্ছনাকে উপেক্ষা করে মানবিক আচরণকেই আশ্রয় করেছেন জীবনভর। কবি - ঔপন্যাসিক - চিত্রশিল্পী রবীন্দ্রনাথ নয়, আমি ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের পরিচয় পাই এই চিঠিগুলির মাধ্যমে। তাঁকে সত্যিই দেবতুল্য মনে হয়। এত পরিশীলিত, এত উচ্চরুচির পুরুষ। মানবদেহে এই ধুলোমাটির পৃথিবীতে তাঁর উপস্থিতি শুধু বিস্ময়কর নয়, অকল্পনীয়। অনেক ক্ষুদ্র মানুষকে তাঁর অনেক বিচ্যুতির কথা বলতে শুনেছি। কিন্তু তাঁরা তাঁদের নিজেদের উচ্চতা কখনও মেপে দেখেননি। যদি দেখতেন, তাহলে বুঝতে পারতেন, মহীরুহের পাশে তাঁরা ধুলোর সঙ্গে মিশে আছেন।

রবীন্দ্রসাহিত্যকে অস্বীকারের নানা সময়ের নানা চেষ্টা হয়েছে; তবু রবীন্দ্রসাহিত্যকে অস্বীকার করা যায়নি। জোড়া পায়ে লাথি মেরে যাঁরা রবীন্দ্র রচনাবলীকে ধুলোয় লুটোতে চেয়েছিলেন (এটা অবশ্য একধরণের স্ট্যান্ট) তাঁরাও পরিণত বয়সে রবীন্দ্রঋণ স্বীকার করেছেন। রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকার করতে হলে যে বাংলাসাহিত্যেকেই অস্বীকার করতে হয়। তবে রবীন্দ্রসাহিত্যের যে বিপুল ভাণ্ডার তার সবই যে কালোত্তীর্ণ রচনা এমন নয়। কবিতার ক্ষেত্রে বলা যায়, বহু কবিতা অতিকথনে দুষ্ট, কিছু কবিতা নিছক কাহিনির বিস্তৃতি; এ-গুলি তাঁর কবিখ্যাতিকে বরং ক্ষুণ্ণ করে। একালের এক বিশিষ্ট সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথের নির্বাচিত কবিতার সংকলন প্রকাশের কথা ভেবেছিলেন, সেটি হলে ভালই হয়। যোগ্য ব্যক্তির এমন কাজে হাত দিলে, তা সমর্থনযোগ্য। কিন্তু অযোগ্য ব্যক্তির হাতে পড়লে সমূহ বিপদ। সবাই তো আর বুদ্ধদেব বসু নন। সাহিত্য - বিচারে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরিই বা কোথায়?

রবীন্দ্রনাথের পর্বতপ্রমাণ রচনা সম্ভার। তা থেকে উৎকৃষ্ট রচনাগুলিকে পৃথক করে নেওয়া বিশেষ জরুরী। রবীন্দ্র প্রতিভার স্বার্থেই সেটা প্রয়োজন।

আমি সামান্য কবিতা লেখক। যদি প্রশ্ন করা হয়, রবীন্দ্র কবিতা আমাকে কতটা প্রভাবিত করেছে কবিতা - সৃজনে? আমি বলবো, অনেকটাই। সৃজন-শিল্পে ঐতিহ্যকে তো অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহ্যের পরম্পরায় সাহিত্যের গতি - প্রকৃতি নির্ণীত হয়। আমি সেই ধারার বাইরে যাব কি করে! কেউ-ই বোধহয় যেতে পারেন না। যাঁরা খুব বেশি কসরত করেন, সাময়িক আলোড়িত হয় চারপাশ, স্তিমিত হতেও সময় লাগে না। পরগাছার সঙ্গে বৃক্ষের অনেকটাই তফাত আছে। বৃক্ষ শেকড়মেলে মাটিতে। আর পরগাছা শূন্যে ঝুলে থাকে। সে পরাশ্রয়ী। তার শেকড় মাটিতে নামে না। প্রত্যক্ষ, পরোক্ষ প্রভাব, এসব বিষয় উত্থাপনের কোনো মানে নেই। শিল্পী, শিক্ষা নেয় জীবন থেকে, সামাজিক বিবর্তন থেকে। এবং নিজেকে প্রকাশের ভাষাও রপ্ত করে নিতে হয় নিজের উদ্ভাবনী শক্তির সাহায্যে। কাউকে অনুকরণ, অনুসরণ করে এগোন যায় না। প্রকৃত শিল্পী কখনও সে-পথে হাঁটেন না। অনুকরণ করা যাঁদের মানসিক প্রবণতা, তাঁরাই এসব করেন। রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ আমাদের অনেকটাই মোহমুগ্ধ করেন; কিন্তু আমরা কখনই তাঁদের অন্ধ অনুকারক হব না। আমরা প্রত্যেকেই নিজের মতো লিখব। যে যার সামর্থ্য অনুযায়ী। সূচনাপর্বে দেখা যায়, আমাদের প্রিয় কবিদের অনুকরণ করতে সচেষ্ট হই। কিন্তু সে তো সাময়িক। যখন নিজের সত্তাকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হই, তখন কলম অন্যের বশ্যতা স্বীকার করে না। নিজের মতো চলে।

আমাদের সামনে আছে রবীন্দ্র - বিগ্রহ। পূজা -পার্বণে ক্রমশই ঢাকা পড়ে যাচ্ছেন, তা হওয়া কোনমতেই বাঞ্ছনীয় নয়। তাঁর সৃষ্টি যদি আমাদের আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসার বিষয় না-হয়, তাহলে রবীন্দ্রপূজায় লাভ কী! সাহিত্য - পাঠে শিক্ষিত সমাজের আগ্রহ অনেকটাই কমেছে। আগে আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে দেখতাম গ্রন্থপাঠের রেওয়াজ আছে। মা, কাকিমাদের হাতেও গল্পের বই শোভা পেতো দুপুরের আলস্যমূহূর্তে। এখন সে-সব দৃশ্য সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। বিনোদনের অন্যান্য উপকরণ গ্রন্থপাঠের সময় কেড়ে নিয়েছে মহিলাদের কাছ থেকে। অন্যদিকে পুরুষদের হাতে অবকাশ খুব কম। আরো চাহিদার প্রয়োজন মেটাতে হিমসিম খাচ্ছেন। এসব কারণে, যে কোনো গ্রন্থপাঠেই অনীহা দেখা যাচ্ছে পাঠকদের মধ্যে। সমকালীন লেখকদের গ্রন্থও এখন সেভাবে পঠিত হয় না। আর রবীন্দ্রনাথ তো অনেকটা সময় অতিক্রম করে এসেছেন। তবু এখনও যে তাঁর গ্রন্থ সমকালীনদের তুলনায় বেশি বিক্রি হয়, সেটাই বিস্ময়ের। কপি - রাইটের দায়বদ্ধতা প্রত্যাহারের পর ছোট বড় বহু প্রকাশনাই তাঁর গ্রন্থ প্রকাশে এগিয়ে এসেছেন। এবং বলা বাহুল্য তাঁর গ্রন্থের চাহিদা বাজারে নিতান্ত কম নয়। নানাজন নানা কারণ হয়তো দর্শাবেন। সবটুকুই যুক্তিগ্রাহ্য, এমন না-ও হতে পারে। রবীন্দ্র-সাহিত্যে অনুরক্ত পাঠক নতুন প্রজন্মেও বিরল নয়। শিক্ষিতের অনুপাতে এই সংখ্যাটা হয়তো অনেক বেশি হওয়া উচিত ছিল; তা হয়নি। অবশ্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাপ্রাপ্ত হলেই সে সাহিত্যানুরাগ জন্মাবে এমন কোনো কথা নেই। পারিবারিক ঐতিহ্য ও জন্মগত অনুরাগই যথার্থ পাঠক তৈরি করে। রবীন্দ্র প্রতিভা এত বিচিত্রগামী, তাঁর অনুরক্তের সন্ধান তিনি করে নেবেন যে-কোন দিক থেকেই। হয় সঙ্গীতের, চিত্রে, নৃত্যের নাটকে, না হয় কবিতায়, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে, চিঠিপত্রে। অন্যদের যে সামর্থ নেই। আমাদের মননে, চেতনায় সর্বত্র রবীন্দ্রনাথ। তাঁকে এড়ানো অসম্ভব, তা পাশ্চাত্য সাহিত্য যতই আমাদের ঘাড়ের উপর চেপে বসুক। পাশ্চাত্যের নানা সাহিত্য - আন্দোলনের ঢেউ, নানা সময় আমাদের ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে; তবু আমরা তলিয়ে যায়নি। বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করেই তার প্রবহমানতা অক্ষুণ্ণ রয়েছে।

স্বরচিত একটি কবিতা উদ্ধৃত ক'রে এ-লেখাটির উপসংহার টানছি। কবির প্রিয় বর্ষাঋতু, সাধনাক্ষেত্র শান্তিনিকেতন আর প্রিয়তমা নারী বৌঠানকে প্রেক্ষাপটে রেখে কবিতাটি রচিত। কত কবিই রবীন্দ্রস্মরণে অসামান্য সব কবিতা রচনা করেছেন। তারপাশে তুচ্ছ কবির এই অকিঞ্চিৎকর উপচার

শান্তিনিকেতনে বর্ষা

গোয়ালপাড়ার দিক থেকে বুনোহাঁসেদের মতো
কয়েক পঙ্‌ক্তি মেঘ উড়ে এসে
ঝিরঝির বৃষ্টি ঝরালো শালের জঙ্গলে।
বৃষ্টি ও মেঘ ভরা শান্তিনিকেতন
মেদুর মোহে আচ্ছন্ন করে মন।
এমন দিনে কি করতেন আপনভোলা করি?
উদয়ন না কি শ্যামলীর বারান্দায়
তৃষিত দৃষ্টিকে রাখতেন বিছিয়ে ভুবনডাঙার আকাশে?
রাঙামাটির ধুলো - ওড়া পথে ধেয়ে আসতো
মুঠো মুঠো সজল হাওয়া?
কবি কি মুগ্ধ আবেশে গুণগুণিয়ে উঠতেন
মনে-মনে গাঁথা গানের কলি?
অন্যদিকে কোপাইয়ের পাড় ধুয়ে নামতো
গেরুয়া জলের ঢল; কলকল শব্দে কোপাই
দেহাতী যুবতীর মতো অঙ্গে দোলাতো কেয়াফুলের গন্ধ?
কবি কি করতে সেইসব মেঘ - মেদুর দিনে?
কার কাছে উন্মুক্ত করতেন হৃদয়ের দরোজা?
তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর পায়চারি - ভরা একাকিত্ব
জানতে ইচ্ছে করে খুব; কি ভেবে
লিখেছিলেন, শ্যামলে শ্যামল তুমি নীলিমায় নীল।
খুব ব্যক্তিগত শোককে কি দিতে চেয়েছিলেন নৈর্ব্যক্তিক মাধুর্য?
বৃষ্টি ও মেঘে ভরা শান্তিনিকেতন;
কান পাতি ঝিরঝির শালের জঙ্গলে।
অঝোর ধারা কতো না স্মৃতি নক্‌শা কাটে!
গোয়ালপাড়ার মেঘ ভুবনডাঙার আকাশে এসে
সরোদে সেধে যায় বেহাগ।